রুমে।

গার্গী তাকিয়ে দেখল ঘড়ির দিকে। তিনটে বেজে বাইশ। কী করে চারটেয় রওনা হবে কে জানে! ঘরে ফিরতেই সায়ন বলল, থানায় গিয়ে কী করে এলেন ওঁরা চারজন তার কোনও আঁচ পেলে।

গার্গী ঘাড় নাড়ে, না। তবে রিপন সেন আমাদের টুরের পরবর্তী আকর্ষণ দেখাতে নিয়ে যাবেন বিকেল চারটেয়।

সায়ন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, চারটে বাজতে আর কতক্ষণ! তার মধ্যে সবাই তৈরি হয়ে বেরোতে পারবে না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

লুনা মুখ ভার করে বলল, ঠিক বলেছ। যা ক্যাচাল চলছে, তাতে টুর শেষ করতে পারব কিনা সন্দেহ। আমার মনে হয় এখনও যদি আমরা মুন্নার থেকে একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাই, তা হলে ঠিক ঠিক সময় টুর শেষ করে তিরুবন্তপুরমে গিয়ে নির্দিষ্ট ফ্লাইট ধরতে পারব।

সায়ন তারিফ করল লুনার দূরদর্শিতার, হেসে বলল, ঠিকই বলেছিস, কিন্তু আমি নিশ্চিত তোর মা এখন এই টুর ছেড়ে যাবে না। একটা জটিল বিষয়ের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, এখন চট করে অব্যাহতি নেবে বলে মনে হয় না!

লুনা গার্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, মা, তুমি কি এই ক্যাচালের মধ্যে ঢুকে গিয়েছ!

সায়ন বলল, না ঢুকে যাবে কোথায়! কোথাও একটা চুরির ঘটনা ঘটেছে বা মার্ডার করার প্ল্যান হচ্ছিল, সেখানে গার্গী চৌধুরী চুপচাপ নির্বিকার থাকছে তা আবার হয় নাকি! এর মধ্যে থানায় একবার ফোন করে কথাবার্তা বলা হয়ে গিয়েছে!

লুনা অবাক গলায় বলল, কিছু পেলে, মা?

গার্গী বলল, পাব আবার কী! খবর নিচ্ছিলাম থানা থেকে কোনও তদন্ত শুরু করেছে কিনা! তা উত্তর এল, যথাসময়ে জানতে পারবেন।

লুনা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, যখন তদন্ত শুরু হবে, তার আগেই আমরা কলকাতা পৌঁছে যাব।

সায়ন বলল, আমি বরং রিপন সেনকে বলি, আজ আর কোথাও যাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। বরং একটা ভাতঘুম দেওয়া যাক। ক'দিন ধরে একটানা জার্নির ফলে সকলেই বেশ ক্লান্ত। আপাতত কারও মনমেজাজও ভালো নেই।

রিপন সেনকে ফোন করে বিষয়টা বুঝিয়ে দিয়ে বলল, আপনি দেখুন বাকিরা কে কী বলছে!

বলে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে গার্গীকে বলল, বাকিরা যদি যায় তো যাক, তোমরাও যেতে পারো, আপাতত আমি ঘুমের দেশে পাড়ি দিই।

গার্গী হাসছিল মনে মনে। কলকাতায় থাকলে বিশ্রাম কাকে বলে জানে না সায়ন। পাগলের মতো তার কোম্পানির নিত্যনতুন প্রোডাকশন নিয়ে ব্যস্ত থাকে, নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকে ফ্যাক্টরিতে। অথচ বাইরে বেরোলে সেই মানুষটাই একেবার অন্যরকম। রোজ সন্ধের পর কলকাতায় ফোন করে একবার করে অফিসের খবর নেয়, কোনও নির্দেশ দেওয়ার থাকলে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দেয়, তারপর মশগুল থাকে টুরের মধ্যে।

সায়নের নাসিকাগর্জন শুরু হতে গার্গীরও মনে হচ্ছিল একটু বিশ্রাম নিতে হবে। শুনে লুনা বলল, তোমরা দু'জনেই তা হলে বিশ্রাম নাও। আমি বরং মোবাইলে গেম খেলে নিই। টুরে বেরিয়ে একটুও গেম খেলতে পারিনি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে রিপন সেনের ফোন এল গার্গীর মোবাইলে, বলল, ম্যাম, আজকের টুর ক্যানসেল। শুনেছেন নিশ্চয় আবার একটা অঘটন ঘটেছে!

–অঘটন! গার্গী লাফিয়ে উঠে বসল, কার কী হয়েছে?

–না, তেমন কিছু নয়। আসলে কী হয়েছে, থানা থেকে আবার একটা ফোন এসেছিল রিসেপশনে।

–কী বলতে চাইছে পুলিশ!

–থানার দারোগা বলছেন তিনি মিস্টার পাকড়াশিকে বলে দিয়েছিলেন মিস্টার তলাপাত্রকে থানায় পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু মিস্টার পাকড়াশি গেস্ট হাউসে ফিরে কাউকে সেকথা না বলে খাওয়াদাওয়ার পর নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। মিস্টার তলাপাত্র তো কিছুই জানেন না। একটু আগে থানা থেকে ফোন করে মিস্টার তলাপাত্রকে খুব যাচ্ছেতাই করে অপমান করেছে। বলেছে থানার ডাক ইগনোর করলে কী হয় জানেন? আপনাকে অ্যারেস্ট করা হতে পারে।

গার্গী উদ্বিগ্ন হয়, কী মুশকিল।

–মিস্টার তলাপাত্র এখনই বেরিয়ে গেলেন থানায়।

–তাই নাকি? একাই গেলেন বুঝি?

–হ্যাঁ। একাই। মিস্টার এম এম রায় খুব করে বলছিলেন তিনি যেতে পারেন সঙ্গে, কিন্তু মিস্টার তলাপাত্র বলে গেলেন, তিনি একাই একশো। কারও প্রয়োজন হবে না।

–ও।

রিপন সেন মোবাইল অফ করতে গার্গীর ভুরুতে ভাঁজ পড়ে। মি. পাকড়াশি থানায় গেলেন কেন, তার কিছুই ভাঙলেন না ফিরে এসে। এমনকি হিরন্ময় তলাপাত্রকেও কিছু বললেন না। বোধহয় ইচ্ছে করেই বলেনি যাতে মিস্টার তলাপাত্র বিপদে পড়েন।

কী বলা যাবে এই ঘটনাকে। প্রফেশনাল রাইভারলি।

না কি আরও জটিল কোনও কারণ!

(ক্রমশ)

অঙ্কন ঃ অভি

গার্গী হাসছিল মনে মনে। কলকাতায় থাকলে বিশ্রাম কাকে বলে জানে না সায়ন। পাগলের মতো তার কোম্পানির নিত্যনতুন প্রোডাকশন নিয়ে ব্যস্ত থাকে, নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকে ফ্যাক্টরিতে। অথচ বাইরে বেরোলে সেই মানুষটাই একেবার অন্যরকম। সায়নের নাসিকাগর্জন শুরু হতে গার্গীরও মনে হচ্ছিল একটু বিশ্রাম নিতে হবে

রসে বশে

ভোমলার ঘরবাড়ি

প্রতিম বসু

যত বড় হচ্ছে, ভোমলাটার হাবভাব সিআইএ–র এজেন্টের মতো হয়ে যাচ্ছে। কারা যেন গুটগুট করে আসে, ফিসফিস করে কথা বলে। তারপর একে একে, ভোমলা–সুদ্ধ, হাওয়া হয়ে যায়।

আরে ও সব এজেন্ট–ফেজেন্ট আমি দেখিনি। আমার দৌড় খবর কাগজের এজেন্ট অবধি। ছোটবেলায় দেয়ালে লেখা দেখতে দেখতে ভালো লেগে গিয়েছে ঃ 'সিআইএ–র এজেন্ট ... জবাব চাই, জবাব দাও।' তখন অতটা বুঝিনি, এখন মনে হয় কেউ যদি কাউকে খুব ভালোবাসে তাহলে সিআইএ–র এজেন্ট বলে। নইলে যারা দেয়াল লিখত আর যাদের নিয়ে লিখত, দু'জনকে এখন হাত ধরাধরি ঘুরতে দেখি কেন? এই তো সেদিন দেখলাম 'এরা', 'ওদের' হয়ে নির্বাচনে দেয়াল লিখছে। ভালোবাসা না থাকলে সম্ভব?

ভালোবাসা আর দেয়াল যেন লসাগু আর গসাগু। একই ইয়ের এপিঠ আর ওপিঠ। প্রেম থাকলেই দেয়াল থাকবে — গররাজি বাবা বা পিসে। আর দেওয়াল থাকলেই প্রেম। কত ভালোবাসা, আজও দেওয়ালে অমর হয়ে আছে। মাঝে অর্শের বিজ্ঞাপন। নীচে বাঙালির ইয়ে। একদম ওপরে উচ্চমার্গেই বলা চলে, 'লাল্টু+পিঙ্কি।'

আশ্চর্য অঙ্ক, কোনও ফর্মুলা নেই। হয় দু'জনেই রেলের লাইনে গলা দিয়ে, মাইনাস। নয়তো প্লাস করে মাইনাস মানে ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে বা ডিভোর্সটা পাকা পেয়ারার মতো ঝুলে আছে, একটু নাড়া দিলেই কোলে এসে পড়বে। এ সব না হলে – লাল্টুর দাঁত নেই, মাথায় টাক, পিঙ্কি আধমণ, কোমরে বাত। মাঝে অনেক দেওয়াল।

এ সব অবশ্য সেই সময়ের কথা যখন ফেস আর বুক আলাদা ছিল। এখন অন্যরকম। সিনেমা হলের মতো — ফি হপ্তায় ছবি বদলে যায়, খালি ক্যাপশনটা একই থাকে — 'জানু'। 'লাইক' অনেক, বাইক আলাদা — নতুন 'জানু'। খুব বেগড়বাঁই কেস না হলে, রেলের দিকে কেউ পা–মাড়ায় না। ওগুলো আগেই সেরে ফেলেছে সবাই ঃ 'মায়ের বকুনিতে, কিশোরীর আত্মহত্যা'। ভালোই হয়েছে। এমনিতেই পাথর ছুড়ে রেল বন্ধ করে দিচ্ছে, তারপর আবার গলা!

ফালতু কথা থাক। ঘটনা হচ্ছে, ভোমলাটা বড় হচ্ছে তাই আমরা হালে একটু বড় বাড়িতে উঠে এসেছি। আগের বাড়িতে জায়গা কম পড়ছিল। বিছানায় ফুটবল, খাবার টেবিলের পাশে বিটকেল গন্ধওয়ালা ফুটবলের 'হোস', এ সব আপদ তো ছিলই, শেষমেশ মাথায় ব্যাটের বাড়ি পড়তেই মাথা খুলে গেল। আরে ও সব কেজিবি কি মোসাদের গল্প না। ব্যাট, আলমারির মাথা থেকে সোজা আমার মাথায়। আর তারপরেই ঠিক করে ফেললাম, বড় বাড়ি চাই। পকেটটা ছোট তাই বাড়ি খুব বেশি বড় হয়নি। তবে কাজের কাজটা হয়ে গিয়েছে। সে ছোকরা এখন তার যাবতীয় সম্পত্তি নিয়ে একটা ঘরে ঢুকে পড়েছে।

ভেবেছিলাম এবার বাকি বাড়িটা আমার হবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। সকাল, বিকেল নেই নানা সাইজের ছেলেপিলের আগমন আর তাদের সন্দেহজনক হাবভাব। ছুটির দিন সকালে আরাম করে খবর কাগজ পড়ছি, দরজায় টক টক। মন দিয়ে লিখছি, টিং–টং। এমন কি ব্যালকনির বাইরে থেকেও নিশির ডাকের মতো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে — 'প্রজিত'। ভোম্বল নামটা যেন না ছড়ায় সে নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে মনে হয়।

এজেন্টরা নাকি ওইরকম হয়। তাদের বসের নাম হয় 'এম'। ভোমলারও 'এম' আছে — এফএমও বলা চলে। ইস্কুলে পড়ায় আর ভোমলার পেছনে টিক–টিক করে। সাইকেল চালাচ্ছিস কেন? চানাচুর খাচ্ছিস কেন? পড়ছিস না কেন? বাড়ি না পরীক্ষার হল বোঝা মুশকিল। এতেও শেষ নেই। সব কিছুর জন্য সেই 'কেষ্টা ব্যাটাই' দায়ী। পান থেকে চুন খসলেই ভোমলার ঘাড়ে। তার বেশি ঘাড় তো বাড়িতে নেই। গুগ্‌ল হিসেব দিয়েছে গত বছর নাকি প্রায় একমাস প্লেন আর বিমানবন্দরে কেটেছে এই অধমের। পৃথিবীটা কখন ছোট হতে হতে মোবাইল হয়ে গিয়েছে। কত কবিতা একা একা মরে গেল — হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকের ছবিটুকুই সম্বল। দেখা করা হয় না। হঠাৎ দেখা হতেও পারে কোনওদিন — কোনও এয়ারপোর্টে বা প্লেনের ভিতর। ত্রিশ হাজার ফুটের ফ্যাকাশে আকাশ, ইকোনমিক ক্লাসের মুরগির খাঁচার মতো সিটে বসে কনুই সামলাব কি কবিতা? ব্যাপারটা বেশ জটিল, প্লেন নয় একদম।

কিন্তু ভোমলার জীবনে এত চাপ নেই। কোনও চাপ দিয়েই তাকে কাত করা যাচ্ছে না। সুযোগ পেলেই 'এম' কে 'মানিপেনি' ভেবে ঘোল খাইয়ে দিচ্ছে। কী বললেন, মানিপেনি সিআইএ নয়? ছাড়ুন তো। ভোমলা 'বন্ড'! ছোটবেলায় অনেক 'জেমস' খেয়েছে। এখন ক্যারাটের ব্ল্যাক–বেল্ট, তাই শুধু বন্ড। আমার সঙ্গে মায়ের। মায়ের সঙ্গে মামার, দাদুর। এর কথা ওর কানে চালান হয়ে যাচ্ছে। এজেন্ট বা ডাবল–এজেন্ট বোঝা শক্ত।

আমি যখন এ শহর ও শহর দৌড়ে বেড়াচ্ছি, মা স্কুলের অঙ্ক ভাবছে, সে তখন কোনও রামপদর মিহিদানার হাঁড়িতে চিনেপটকা ফাটানোর তোড়জোড় করছে কিংবা দলবল জুটিয়ে কোথায় মিহিদানা পাওয়া যায় তার খোঁজ রাখছে। ওই যে ফিসফাস, গুজগুজ সব মিহিদানার জন্য। বন্ধুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বাবা–মায়ের দেওয়া বেড়া টপকে বাইরের হাওয়া ঘরে ঢুকছে। ঘরটা এবার বাইরে বেরোবে। বাড়িটা ওদের হবে, আমরা থাকব। এমনই চলবে এখন, কিছু বছর। তারপর সব ভোজবাজির মতো উড়ে যাবে। গরু ভাগলবা — পড়া, রাজনীতি, চাকরি, প্রেম, অপ্রেম, বিচ্ছেদ। মিশন–মার্স হোক বা চন্দ্রায়ণ ২ — মেচেতার মতো দাগওয়ালা কতকগুলো স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই আমাদের হাতে থাকবে না। সানাইওয়ালার শতরঞ্চি গোটানোর সময় এগিয়ে আসছে।

দাশুরা আর আগের মতো পাগলা নেই তো কি, ছোটবেলাগুলো আগের মতোই অমলতাস ফুলের মিহি সোনালি দানার মতো গায়ে মাথায় ঝরতে থাকে। মেখে নিতে হয়। তারপর কখন যেন, দানাগুলো টাকা হয়ে যায়। জীবনটা অ্যাপে ঢুকে পড়ে। সম্পর্কগুলো বাসি গোলাপের পাপড়ির মতো কুঁকড়ে যেতে থাকে। প্রথমে বোঝা যায় না, ড্রয়িং রুমের ফুলদানিতে দিব্যি লাগে। বয়সের মাহাত্ম্যই ওই বাসি আর তাজার তফাৎ না করতে পারা। খসে পড়ার সময়ে টের পাওয়া যায়, এবার যাওয়ার সময় হল। স্মৃতিগুলো কিছুদিন মিহি ধুলোর আস্তরণের মতো পড়ে থাকবে। তারপর আবার সব পরিষ্কার। এবার বসার ঘরে, নতুন সোফা, তাতে নতুন কোনও মিহি সম্পর্ক। নতুন এজেন্ট — সিআইএ–র এজেন্ট।

আমি থাকব না তো কী হয়েছে। ভালোবাসাটা থাকবে। থেকেই যাবে।

অঙ্কন ঃ অভি